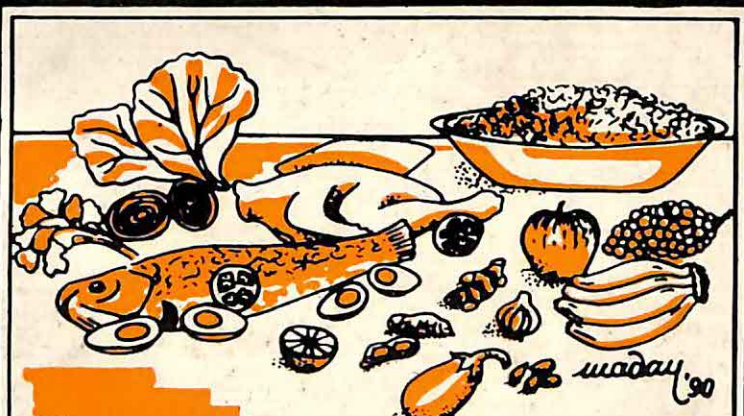
রুচি-রন্ধন-পুষ্টি

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়



বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

রুচি-রন্ধন-পুষ্টি

হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-২৩, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

প্রকাশক ঃ
অপরাজিত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রথম প্রকাশ—১লা জানুয়ারী ১৯৯১

মুদ্রক ঃ শৈলী
৪এ, মানিকতলা মেইন রোড
কলিকাতা-৫৪

প্রচ্ছদ ঃ মদনমোহন সামন্ত

মূল্য ঃ আট টাকা

ভূমিকা

খাদ্য সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের শেষ নেই। ক্ষুধার মোকাবিলাতেই যে সর্বদা আমরা আহার করি তা নয়, উৎসব-আনন্দে মেতে ওঠার অপরিহার্য শর্তও অতি উত্তম ভোজন। কিন্তু খাদ্যকে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত অনেক সময় আনন্দ বজায় থাকে না। হজম একটা বড় ব্যাপার, তাকে অবহেলা করা চলে না। এখানেই আসে খাদ্যের গুণাগুণের কথা, পাচ্য-অপাচ্যের ব্যাপার। তাছাড়া, ক্ষুধার উদ্রেক করার জন্য চাই আদর্শ পাচকের হাতের ছোঁয়া, উপযুক্ত পরিমাণ ও মানের মশলা। রন্ধন একটি শিল্প; যার তার কাজ নয় ভালো রাঁধুনী হওয়া। খাদ্যের বড় ভূমিকা একটি —তা হলো দেহকে সচল রাখার ভূমিকা। খাদ্যের কোন অংশ শ্বেতসার, কোনটা প্রোটিন, কোনটা স্নেহ। খাদ্যে মিশ্রিত থাকে লবণ ও ভিটামিনগুলি। সুষম খাদ্য কাকে বলে তা না জানলে শরীর ভালো রাখা যায় না, রোগভোগের থেকে দূরেও থাকা যায় না। পুষ্টি বিষয়টা মোটেই হেলাফেলা করার বিষয় নয়।

সাধারণ মানুষের মধ্যে রন্ধন, পুষ্টি ও খাদ্য রুচি নিয়ে কিছুটা ধ্যানধারণা গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের প্রবীণ চিকিৎসক-সদস্য ডাঃ হেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই পুস্তিকাটি লিখেছেন। সহজ ভাষায়, সহজ কথায় ও ভঙ্গীতে, সরস বাক্যের সঙ্গে তিনি বক্তব্য পরিবেশন করেছেন, যা এক কথায়, সরস ভোজ্যের সঙ্গেই তুলনীয়।

আশা করবো, এই পুস্তিকাটি জনসাধারণ আনন্দের সঙ্গে পাঠ করবেন এবং খাদ্য পুষ্টি সম্পর্কে একটি সঠিক চিন্তা ভাবনার শরিক হতে পারবেন।

অপরাজিত বসু
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

১লা জানুয়ারী, ১৯৯১
কলকাতা

সূচী

অনুবন্ধ

শরীর গঠনের জন্য ভোজন জীবমাত্রেরই প্রয়োজন। এই প্রয়োজন বোধটা প্রথমত সহজাত বুদ্ধির দ্বারাই পরিচালিত হয়। মানুষও প্রথমাবস্থায় সহজাত বুদ্ধির দ্বারাই খাদ্য আহরণ করত। সভ্যতার অগ্রগতির সংগে মানুষের খাদ্যেরও রকম ও প্রস্তুত প্রণালী পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে চলেছে যাতে ভোজন আরো তৃপ্তিদায়ক হয়। বৈদিক সংস্কৃতে ভোজন শব্দের দুটি অর্থ ছিল। ভোজন অর্থে সুখানুভূতি এবং খাদ্য। ভোজনে জৈবিক প্রয়োজন ছাড়া একটা তৃপ্তি বা আনন্দের অনুভূতি আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

সাধারণত শরীরে কী প্রয়োজন, কতটা প্রয়োজন এ সব নিয়ে বিচার বিবেচনা করে আমরা আহার করি না। ক্ষুধা নিবৃত্তি এবং রুচির উপরই জোর দিই। লোকপরম্পরায় পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতাতেই খাদ্যতালিকা প্রস্তুত হয়েছিল। আধুনিক কালে বৈজ্ঞানিকরা খাদ্যগুলোকে প্রয়োগ-শালার আওতায় এনে দেখতে চাইলেন—খাদ্যগুলোর উপাদান কি, তাদের কার্যকারীতাকে, পরিমানই বা কী হওয়া উচিত ইত্যাদি ইত্যাদি। এই রকম গবেষণায় আবিষ্কৃত হয়েছে যে আমরা যত রকম খাদ্য খাই তারা রাসায়নিক দিক থেকে তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। ঐ ভাগ বা তিনটি মূল উপাদান হল শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ। এর সঙ্গে অবশ্য আরো তিনটি সহকারী উপাদানও আমরা খাই, যথা ধাতব লবণ, ভিটামিন, জল। সুস্বাস্থ্য রাখতে এগুলি গ্রহণও অপরিহার্য।

মানুষ এইসব বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব জানুন বা নাই জানুন মূল উপাদানযুক্ত খাদ্যগুলি খেয়েই জীবনধারণ করেন। সহজাত বুদ্ধিতে এবং ক্ষুধার

দ্বারা পরিচালিত হয়ে ঐ সব পর্যায়ের খাদ্য আহার করে থাকেন ঠিকই কিন্তু বৈজ্ঞানিক তথ্য না জা লে তিনি সুষম বা উৎকৃষ্টতম খাদ্য-সমাহার খেতে পারবেন না। ক্ষুধা মিটবে কিন্তু অতি ভোজন, কম ভোজন বা একটি পূর্ণ ভোজন হবার সম্ভাবনা থেকে যায় এবং অদূর ভবিষ্যতে সুস্বাস্থ্য রাখা সম্ভব না-ও হতে পারে।

এই পুস্তিকা বিভিন্ন উপাদানের সহজ উৎস, প্রয়োজনীয়তা, খাদ্যের রন্ধন প্রণালী পুষ্টি সংরক্ষণ এবং আনুষঙ্গিক তথ্য বিবৃত করা হয়েছে। স্বভাবতই স্বল্প পরিধির মধ্যে খুব ব্যাপক বা বিশদ আলোচনা সম্ভব নয় এবং হয়ওনি। তবুও সাধারণের পক্ষে জ্ঞাতব্য বহু বিষয় আলোচিত হয়েছে।

পুস্তিকার প্রবন্ধগুলি আজকাল, জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

শর্করা

আমরা যা খাই এর প্রতিটি খাদ্যেই শরীরের প্রয়োজনীয় সকল রকম উপাদানই অল্পবিস্তরভাবে বর্তমান থাকে। আবার কোন কোন খাদ্যে এক এক রকম উপাদানের ভাগ তুলনামূলক ভাবে অধিক পরিমাণে থকে। যে খাদ্যে যে ধরনের উপাদান অধিক পরিমাণে থাকে তাকে সেই পর্যায়ের খাদ্য হিসাবে ধরা হয়। যেমন চাল শর্করাজাতীয়, মাংস প্রোটিনজাতীয়, ঘি স্নেহজাতীয় ইত্যাদি।

আমাদের খাদ্যের মধ্যে পরিমাণগতভাবে প্রধান খাদ্য হল শর্করা জাতীয়, যেমন–ধান থেকে চাল, মুড়ি, খই, চিঁড়ে ইত্যাদি। গম থেকে– আটা, ময়দা, সুজি। এছাড়া যব, বজরা প্রভৃতি। সবগুলিই সামান্য তারতম্য ব্যতিরেকে একইরকম ভাবে উপকারী। পশ্চিম বাংলায় ভাতেরই প্রচলন বেশী, তাই ভাত ও ধান জাতীয় অন্যান্য দু-একটি খাদ্যের বিষয় আলোচনা করা হবে।

বাঙালীর খাদ্যের প্রধান উপকরণ হল ভাত এবং ডাল। আমাদের অনেকেই 'ভেতো বাঙালী' বলে। কথাটা কিছুটা উপহাস করেই বলা হয়–তুলনামূলকভাবে আমরা শারীরিক শক্তিতে দুর্বল বলে। আমাদের এই দুর্বলতা কিন্তু ভাত খাওয়ার জন্য নয়। বাঙালী ছাড়া ওড়িশা, দক্ষিণ ভারত, ব্রহ্মদেশ, চীন, জাপান দূর-প্রাচ্যের বহু দেশের মানুষেরই প্রধান খাদ্য ভাত।

ধান থেকে চাল তৈরি করার দুটি উপায়। সরাসরি বীজ ভেঙ্গে চাল করা অর্থাৎ আতপ চাল। অপরটি ধান সিদ্ধ করে নিয়ে ভাঙ্গা। চালের উপরি স্তরে কিছু ভিটামিন থাকে, ধান ভাঙ্গার সময়

কোন অংশে কম নয়। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হল ডাল। সব ডালেই যথেষ্ট পরিমাণে প্রোটিন আছে। সয়াবীনে সব থেকে বেশী। ডালের প্রোটিনের একটা অসুবিধা–এর সবটুকু আত্তীকরণ করা যায় না। ডালের আর একটা বিশেষ উপকারিতা আছে। ডালে স্যাপোনিন (saponin) নামক একটি রাসায়নিক পদার্থ থাকে যেটির উপকারিতা হল রক্তে কলেস্টিরল (cholesterol) কমানোর ক্ষমতা রাখে অর্থাৎ হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা কমে যায়। ডালে আমরা বিশেষ করে পাই শরীর গঠনের উপযোগী প্রোটিন। আর পাই ভিটামিন-এ, নিকোটিনিক অ্যাসিড, পাই-রিডক্সিন এবং ধাতব লবণ, যথা ক্যালসিয়াম্, ফসফরাস, লৌহ ইত্যাদি। সুতরাং ভাত ও ডালে আমরা যে শুধু শর্করা ও প্রোটিন পাই তা নয়, কিছু ভিটামিন ও ধাতব লবণও পাই। ভাত ডাল আলাদা না খেয়ে যদি মিশিয়ে খিচুড়ি তৈরি করা যায় এবং তার মধ্যে যদি দু-একটি পিঁয়াজ ও অন্যান্য আনাজ দেওয়া হয় তাহলে তা শুধু মুখরোচক হয় তা নয় অত্যাবশ্যক উপাদান ভরা একটি প্রায় সুষম খাদ্য হয়ে ওঠে। স্নেহ পদার্থ ছাড়া আর সব উপাদানই তাতে পাই । দুটি উপাদানেই ভিটামিন বি গোষ্ঠী থাকে, ভাতে যা নাই ডালে তা পুরণ হয়। গরম খিচুড়ির সঙ্গে একটু ঘি দিয়ে খাওয়ার রেওয়াজ আছে। তা করলে তো খাদ্যটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সুষম খাদ্য হয়ে গেল।

সব ডালই উপকারী। সয়াবীনে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রোটিন থাকে। কল বার করা ভিজান ছোলা প্রাতরাশে খেলে একাধারে প্রোটিন ও প্রচুর ভিটামিন পাওয়া যাবে।

আমিষ প্রোটিন

মাছ, মাংস, ডিম উৎকৃষ্ট আমিষ প্রোটিন। দু-একটি খাদ্যের বিশেষত্ব বিচার করা হবে। পরে কয়েকটি আমিষ খাদ্যের প্রোটিন পরিমাণ জানান হবে।

মাছ

মাছ অতি সুপাচ্য প্রোটিন এবং ধাতব লবণে সমৃদ্ধ। মাছের দাম অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় সকলের পক্ষে নিজ প্রয়োজন মত মাছ খাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। কিন্তু দামী মাছ যেমন আছে তেমনি কম দামী মাছও আছে। সব মাছেরই উপকারিতা প্রায় এক রকম—সামান্য তারতম্য। পমফ্রেট, পুঁটি, সিঙ্গি, ল্যাটা, সোল এগুলোর বেশী চল নেই। কিন্তু এগুলিকেও অবহেলা করা উচিত নয়।

মাছের আর একটি উপকারিতা আছে। মাছের তেল খেলে রক্তের কোলেস্টরলের পরিমাণ কম থাকে। এটা অনেকেই জানেন রক্তে কোলেস্ট-রলের পরিমাণ সীমার উপর বৃদ্ধি পেলে হৃদযন্ত্রের শিরায় রক্ত চলাচল ব্যাহত হয়, ফলে করোনারি ইসকিমিয়া (coronary ischemia) হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। সুতরাং মাছ খেলে সে সম্ভাবনা আয়ত্তের মধ্যে থাকা সম্ভব। পরিসংখ্যান নিয়ে দেখা গেছে দৈনিক ২০০ গ্রাঃ মাছ খেতে পারলে রক্তে কলেস্টেরল ও ট্রাইগ্লিসারাইড নিশ্চিতভাবে সীমিত থাকে।

মাংস

নীচের কয়েকটি আমিষ জাতীয় খাদ্যের গুণাগুণের তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হল। তার সঙ্গে নিরামিষ প্রোটিন ডালেরও তালিকা দেওয়া হয়েছে। তুলনা করার জন্য মাংসের প্রসঙ্গে আসা যাক।

প্রথমেই একটি কথা বলে নিতে চাই। তালিকায় দেখবেন গরুর মাংস এবং শূয়োরের মাংস রাখা হয়েছে। এদুটি মাংস যদিও সাধারণ

বাঙ্গালীর খাদ্য নয়। আজকাল শুয়োরের মাংস খাবার খুব চল হয়েছে (পার্ক-সালামি সসেজ)। কিছুদিন পূর্বে কোন কোন সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে গোমাংস খাবার পক্ষে জোরালো যুক্তি রাখা হয়েছে। দুটি কারণ দেখানো হয়েছে। প্রথমটি পুষ্টি, দ্বিতীয়টি মূল্য। তাঁরা ধর্মীয় অনুশাসনের কুসংস্কার ত্যাগ করতেও বলেছেন। কিছু ব্যায়ামবিদ তরুণদের কাছে থেকে জানলাম তাদের গুরুরা বলেছেন শুয়োরের মাংস খুব পুষ্টিকর। সুতরাং তারাও স্বাস্থ্যলাভের জন্য শুয়োরের মাংস ধরেছেন। যে কোন ব্যক্তি এ দুটি মাংস ইচ্ছা করলে খেতে পারেন কিন্তু সেগুলি উৎকৃষ্টতর বলে প্রচার করার কোন যুক্তি বা বিজ্ঞানসম্মত কারণ নাই। আজকাল অনেকে শুয়োরের মাংস খান এবং নিরামিষভোজী জৈন ও হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকও আমিষ খাচ্ছেন। আমিষ খাদ্য খেলে জাত যাবে এমন ভয় বর্তমান সমাজে আছে কিনা সন্দেহ, অন্তত শহরে নেই। এইবারে নীচের তালিকা লক্ষ করে দেখুন। গরু এবং শুয়োরের মাংস, মাটন ও পমফ্রেট মাছের মধ্যেই অপেক্ষাকৃত বেশী প্রোটিন রয়েছে। গোমাংসে সর্বাপেক্ষা বেশী বটে কিন্তু তফাৎ সামান্যই। মাটনে ও শুয়োরের মাংসে সমান সমান। গোমাংসের পরই পমফ্রেট মাছ। গরুর মাংসে প্রোটিন যেমন অপেক্ষাকৃত বেশী তেমনি মাটন ও শুয়োরের মাংসে ফ্যাট, ধাতব লবণ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস এবং ক্যালরি উল্লেখযোগ্যভাবে বেশী। এগুলিও স্বাস্থ্যের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এইবারে মূল্যের আলোচনা করা যাক। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বস্তুর চাহিদা বাড়লেই মূল্য বৃদ্ধি হয়, হয়েছেও তাই। গোমাংস কিছুদিন আগে ৬-৮ টাকা কে,জি,তে পাওয়া যেত। এখন দাম হয়েছে ১০-১২ টাকা কে,জি,। শুয়োরের মাংস ৫-৬ টাকা থেকে এখন হয়েছে ১৪-১৫ টাকা কে,জি,। উৎকৃষ্ট শুয়োরের মাংস (ham) ৩০-৩২ টাকা কে,জি,। গরু ও শুয়োরের মাংস ভাল করে সিদ্ধ করে না খেলে ফিতা কৃমির (tape worm) ডিম্ব বা বীজগুলি অন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করে ফিতা কৃমিতে পরিণত হতে পারে।

আউন্স প্রতি-গ্রাম হিসাবে

খাদ্য	প্রোটিন	ফ্যাট	ধাতব লবণ	ক্যালসিয়াম	ফসফরাস	লৌহ	ক্যালরি	ভিটাঃ এ	ভিটাঃ বি	রিবোফ্লোভিন	ভিটাঃ সি
গোমাংস	৬.৪	০.৭	০.৩	৩	৫৪	০.২	৩২	১৭	১৪	১১	১
হাঁসের ডিম	৩.৮	০.৯	০.৩	২০	৭.৪	০.৯	৫১	৩৪০	০	০	০
মুর্গির ডিম	৩.৮	৩.৮	০.৩	১৭	০.২	০.৬	৪৯	৩৪০	০	০	০
মটন	৫.৩	৩.৮	০.৪	৪৩	৪৩	০.৭	৫৫	৯	১৭	৭৭	০
শুকর মাংস	৫.৩	১.২	০.৩	৮	৫৭	০.৭	৩২	০	৫১	২৬	১
পমফ্রেট	৫.৪	০	০	৫৭	৮২	০.৩	২২				
ছোলা খোলা-সমেত	৪.৯	১.৫	০.৮	৩৪	৬৮	২.৮	১০৩	৯০	২৮		
গাছ ছোলা	৬.৪	০.৪	১০০	৪০	৮০	২.৪	৯৫	৪৫	৪৪		
মুসুর	৭.১	০.২	০.৬	৩৭	৭০	০.৬	৯৮	১২৮	৪৯		
সয়াবিন	১২.৩	৫.৫	১.2	৭০	২০০	৩.৩	১২২	২০২	৮৫		
চিনা বাদাম	৭.৬	১১.৩	০.৫	১৪	১১০	০.৫	১৫৬	১৮	৮৫		
ঐ ভাজা	৮.৯	১১.৩	০.৭	১৪	১২০	০.১	১৫১				

স্নেহপদার্থ

স্নেহ পদার্থ বা চর্বি ও শর্করা এবং প্রোটিনের মত অবশ্য আহার্য উপাদান। চর্বির মাধ্যমেই আমরা প্রাকৃতিক ভিটামিন এ ও ডি পেয়ে থাকি। অন্যান্য উপাদানের তুলনায় চর্বি কম লাগে। ৪৫ থেকে ৬০ গ্রামের মধ্যে এর প্রয়োজন। দৈনিক ৫০ গ্রাম হলেই যথেষ্ট। শর্করা ৪০০ গ্রাম এবং প্রোটিন ৭০ থেকে ১০০ গ্রাম প্রয়োজন। চর্বি তুলনামূলক ভবে বেশী শক্তি সঞ্চার করে। দুধ, ঘি, মাখন, মাংস, ডিম চিনেবাদাম, কাজু বাদাম, সয়াবিন ইত্যাদিতে অধিক স্নেহ পদার্থ থাকে।

ডিম

মানব জাতি অতি সুশীল। যা পায় তাই খায়। রসনা তৃপ্তির জন্যে উদ্ভিজ্জ, প্রাণীজ কোন আহারেই অনীহা নেই। মানুষ গাছের মূল খায়, কাণ্ড খায়, পাতা খায়, ফুল ফল তো খায়ই। প্রাণী জগতের জলচর খেচর উভচর কোন ধরনের প্রাণীই অব্যাহতি পায় না। শুনেছি কাক কাকের মাংস খায় না। কিন্তু মানুষ নাকি মানুষের মাংস খায়। অণ্ডজ প্রাণী খেয়ে মানুষের পেট ভরে না, তাই অণ্ডের উপর তার প্রচুর লোভ। এই ডিম খাওয়া নিয়ে আবার নানান বাদবিতণ্ডা। আমিষভোজীরা বলেন ডিম আমার, নিরামিষভোজীরা বলেন ওটা আমার। ডিমের মধ্যেও আবার জাতিভেদ আছে। লোকাচার বলে হাঁসের ডিম হিঁদু, মুরগির ডিম ম্লেচ্ছ। ডিম যে উপাদেয় সে বিষয়ে কিন্তু কারো বিরোধ নেই। কাঁচা খাও, অর্ধপক্ক খাও, পুরাপক্ক খাও, গুলে খাও—যেমন করেই খাও বেশ লাগে। অনভিজ্ঞ বিজ্ঞরা বলেন কাঁচা খাও গায়ে বল বাড়বে। ধারণা ভুল। কেউবা আবার সাদা অংশটা ফেলে দিয়ে শুধু হলদেটা

খান। পয়সা দিয়ে খাদ্য কিনে তার খানিকটা পুষ্টিকর অংশ ফেলে দেওয়ার কি সার্থকতা? ভোজনবিলাসীরা বলেন ওসব কথা বাদ দাও। বানাও ডবল ডিমের মামলেট ওমলেট কিংবা আণ্ডাকারী, মৌজ করে খেয়ে বাঁচি। অনভিজ্ঞ বিজ্ঞরা আরো বলেন ডিম বড় গরম, গরম কালে খেয়ো না। ভোজনবিলাসীরা বলেন—সব ঋতুতেই ডিম খাই, কোন খেসারত দিতে হয় না। তার্কিক তর্ক ছাড়ে না। বলেন—আচ্ছা, তাও যদি খাও ত কম খাও, বেশী খেলে হজম করতে পারবে না। এমন ভোক্তাও দেখা যায় যারা এক সঙ্গে ১০-১৫টি ডিম উদরস্থ করতে পারেন। সুস্থও থাকেন। তবে এ উদাহরণ সকলে অনুসরণ করলে, হাঁস-মুরগি ডিম পেড়ে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারবে না। ডিমের খোলাটি নিটোল নিশ্ছিদ্র। সুতরাং ভিতরের অংশ খেলে কোন সংক্রামক ব্যাধি বাধবার সম্ভবনা থাকে না। আজকাল কাউকেই বিশ্বাস করা যায় না। কৌতুহলী জীবাণু-বিজ্ঞানী অনুসন্ধান করে দেখলেন যে শতকরা ৩০ ভাগ ডিমের ভিতর বিভিন্ন জীবাণুর বাস। তারা আপাতদৃষিটতে ক্ষতিকর নয়। কিন্তু ভিতরে যাবার উপায় যখন আছে মারাত্মক জীবাণুর শরীরে প্রবেশ করার অন্তরায় কোথায়? কাঁচা ডিম ভোক্তারা ভাবনায় পড়লেন ত? আবার একদল সর্বজ্ঞ আছেন। তাদের মতে হাঁসের চেয়ে মুরগির ডিম বেশী উপকারী। এবার কিন্তু তাঁরা বিজ্ঞানীর বয়ানের কাছাকাছি গেছেন। প্রোটিন, ফ্যাট ভিটামিন এ ক্যালোরিতে দু-রকমের ডিমই তুল্য মূল্য, কিন্তু ধাতব পদার্থে অর্থাৎ ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহের ভাগ হাঁসের ডিমে অপেক্ষাকৃত বেশী। ডিমের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে ডিমের প্রোটিনের প্রায় অংশটাই শরীরে আত্তীকরণ করা যায়। ভূমণ্ডলের সর্ব খণ্ডেই আণ্ডার প্রচলন ও চাহিদা প্রচণ্ড। এত পুষিটকর এবং মুখরোচক খাদ্য—হবে নাই বা কেন? হাঁস-মুরগির ডিম ছাড়া কোন কোন স্থানে পক্ষিবংশের অন্যান্য প্রজাতির এবং কাছিমের ডিম ভোজনেরও প্রচলন আছে। এছাড়া মৎসকূলের ডিমও কি আমাদের আকুল করে না? যে মৎসভোজী ইলিশ মাছের ডিম ভাজা খায় নি তাঁর জীবনই বৃথা। কই মাছের ডিমের বড়া কিম্বা অম্বল

রসনাকে কম লালায়িত করে না। মানব জাতির এত আদর পেয়েই না ডিমের দর উত্তরোত্তর উর্ধ্বমুখী।

ডিমের বিষয়ে একটি খুচরো খবর জেনে রাখা ভাল। কাঁচা ডিম ও সিদ্ধ ডিমের পুষ্টির পার্থক্য নাই। ডিমের রং যেমনি হোক খুব চকচকে যেন না হয়। চকচকে ডিম খারাপ হতে পারে। ডিম পচা কিনা জানতে হলে একপাত্র ঠাণ্ডা জলের মধ্যে ডিম ফেলে দিতে হয়, যদি ভেসে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে ডিম টাট্‌কা নয়। ডিমের খোলার উপর একটা সহজাত দ্রবপদার্থের আস্তরণ থাকে যা জীবাণুর অনুপ্রবেশ রোধ করে। সেইজন্য রান্না করবার বেশীক্ষণ আগে ডিম ধুয়ে রাখা ভাল না। ডিমে কলেস্টেরলের ভাগ বেশী। সুতরাং বয়স্ক লোকের এবং হৃদযন্ত্রের অসুখ থাকলে ডিম খাওয়া উচিত হবে না।

ভোজ্য তেল

উপরিউক্ত খাদ্যগুলি ছাড়া কতকগুলি ভোজ্যতেলেও অল্প পরিমাণ চর্বি থাকে। আমিষ নিরামিষ দুই পদের রান্নাতেই কিছু ঘি তেল ব্যবহৃত হয়। আমাদের দেশে শুধু ঘি দিয়েও রান্না হয়। রান্নার জন্য কয়েকটি ভোজ্য তেল ব্যবহার করা হয়। অন্যান্য প্রদেশে নারকোল, তিল বা বাদাম তেলের প্রচলন। আমাদের রাজ্যে সরষের তেল ব্যবহার করা হয়। ভোজ্য তেলেও দু-ধরনের চর্বি আছে—সম্পৃক্ত চর্বি (Saturated Fatty Acid), অসম্পৃক্ত চর্বি (Unsaturated Fatty Acid)। অধিক পরিমাণ সম্পৃক্ত চর্বি খেলে, ঘি বনস্পতি মাখন মাংস ইত্যাদি খেলে রক্তে কলেস্টরল বাড়বার সম্ভবনা। সেইজন্য এগুলির পরিমাণ সীমিত রাখতে হবে। কোন কোন ভোজ্য তেলে সম্পৃক্ত চর্বি থাকে সেগুলি বয়স্ক লোকদের বর্জনীয়। অসম্পৃক্ত চর্বি থাকা কিন্তু বাঞ্ছনীয়।

নীচে কয়েকটি ভোজ্যতেলের সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত চর্বির পরিমাণ দেওয়া হল।

প্রতি ১০০ গ্রাম পিছু হিসাব

ভোজ্যবস্তু	সম্পৃক্ত চর্বি (Saturated Fatty Acid)	অসম্পৃক্ত চর্বি (Unsaturated Fatty Acid)
ঘি	২৬.০	৩১.০
বনস্পতি	২৫.৩	১.৯
বাদামতেল	২৬.০	৩১.০
তিলের তেল	১৩.০	২৭.৭
সরিষার তেল	৫.৫	১৮.১
সয়া তেল	১৫.০	৫০.৮
স্যাফোলরি তেল	৯.৪	৭৩.২
লোব্রবীজের তেল		
নারিকেল তেল	৮৬.৮	১.৮
মাখন	৫১.৪	২.১৪

ধাতব লবণ ও ভিটামিন

শরীরের বিভিন্ন কোষে ও কলায় নানাবিধ ধাতব পদার্থের অস্তিত্ব দেখা যায়। যেমন দাঁত ও হাড়ে যথেষ্ট পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাস কিংবা রক্তে লৌহ। দৈনিক ২০--৩০ গ্রামের মত ধাতব পদার্থ শরীর থেকে নিঃসৃত হয় -- যথা ক্লোরাইড, ফসফরাস, সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি। অর্থাৎ ধাতব পদার্থ শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয়। নুন অর্থাৎ সোডিয়াম ক্লোরাইড ছাড়াও রান্নাই হবে না। এই ক্ষয় অবশ্যই পূরণ করা আবশ্যক। ধাতব লবণ কোন একটি বিশেষ খাদ্যেই অধিক পরিমাণে থাকে না। বিভিন্ন প্রকার খাদ্যে ছড়িয়ে আছে এই ধাতুগুলি।

ভিটামিন সম্পর্কে

"ডাক্তারবাবু বড় দুর্বল মনে হচ্ছে একটা ভাল ভিটামিন লিখে দিন ত"। কিংবা "আমি রোজ একটা করে বিকোসিউল (ভিটা বি ও সি) খাই"। কিংবা "যখন শরীরটা দুর্বল বোধ করি তখন ২-৩ দিন অন্তর একটা করে বিকোসিউল খাই ব্যাস, ঠিক হয়ে যায়"। এরকম আলাপ আলোচনা যে কোন ডাক্তারের চেম্বারে বা পরস্পর আলোচনায় শোনা যায়।

এই আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে অনেক মানুষের ধারণা শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষে যে ভিটামিনগুলি শক্তিবর্ধক এবং যাবতীয় রোগ প্রতিরোধক। এমনকি সুস্বাস্থ্যের আশায় চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়াই মুঠো মুঠো ভিটামিন খাওয়া হয়। ভাবখানা ভিটামিনের মত অমন উপকারী এবং নিরাপদ ওষুধ (এই হিসাবেই ব্যবহার করা হয়) আর বুঝি হয় না।

এখন বিবেচনা করা যাক ভিটামিন কি পদার্থ। প্রথমেই বলে রাখি ভিটামিন কোন ওষুধ নয়। এটা আমাদের খাদ্যের অন্যতম উপাদান মাত্র। অন্যান্য উপাদানের খাদ্যের মত এটা আলাদা কোন খাদ্যে পাওয়া যায় না। আমিষ, নিরামিষ বিবিধ খাদ্যের মাধ্যমেই আমরা ভিটামিন সংগ্রহ করি। আবহমান কাল ধরে নানা খাদ্যের মাধ্যমে এই সব ভিটামিন খেয়ে আসছি। এর অস্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য কিন্তু জানা ছিল না। মাত্র একশ বছর পূর্বে ওলন্দাজ অধ্যাপক আইকম্যান এই উপাদানের অস্তিত্বের বিষয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং ১৯১২ খৃস্টাব্দে কেমব্রিজের অধ্যাপক স্যার এফ্‌গাওল্যাণ্ড হপকিন্‌স এর প্রয়োজনীয়তা এবং উপকারিতা প্রমাণিত করেন। এর জন্য ঐ দুই বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার পান। অন্যান্য উপাদানের তুলনায় এর আবশ্যক পরিমাণ নিতান্ত নগণ্য। খাদ্যের অন্যান্য উপাদান যথা প্রোটিন, স্নেহ, শর্করার দৈনিক প্রয়োজন যথাক্রমে কমবেশী ১০০, ৬০, ৪০০ গ্রাঃ কিন্তু ভিটা-এ ০·০১ মি গ্রাঃ, বি গোষ্ঠীর ভিটামিনগুলি ১০ মাইক্রোগ্রাম থেকে ১৫০ মিঃ, গ্রাঃ, সি ১০-৫০ মিঃ গ্রা, ডি ০·০৫ মিঃ গ্রা মাত্র। প্রোটিন, স্নেহ, শর্করা শরীরের বৃদ্ধি, কলার ক্ষয় পূরণ করা এবং বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ভিটামিনগুলির নিজস্ব কাজ হল ঐ সব উপাদান আত্তীকরণ ও তাদের বিশেষ বিশেষ কাজে সহায়তা করা। অন্যান্য উপাদানগুলি স্থূলভাবে শরীরের পুষ্টি রক্ষা করে, ভিটামিন সূক্ষ্মভাবে নানা দিক দিয়ে স্বাস্থ্য রক্ষায় সামঞ্জস্য বিধান করে। শরীরের পুষ্টি ও শক্তির জন্য প্রাথমিক উপাদানগুলি পর্যাপ্ত পরিমাণে না আহার করলে অপর্যাপ্ত ভিটামিন সেবনের কোন সার্থকতা নেই। একটি উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝান যেতে পারে। আমরা নানা রকম সব্জী, মাছ মাংস ইত্যাদি দিয়ে যখন ব্যঞ্জন রাঁধি তখন ঐগুলি মশলা ফোড়ন দিয়ে সাঁতলে নিই। তবে ব্যঞ্জন উপাদেয় হয়। ব্যঞ্জন স্বাদু করতে ফোড়নের যতটুকু কার্যকারিতা শরীর সুস্থ রাখতে ভিটামিনের ততটুকুই কার্যকারিতা। অপরপক্ষে পরিমাণের অতিরিক্ত মশলায় যেমন ব্যঞ্জন বৃথা হয়ে যায় তেমনি মাত্রাতিরিক্ত ভিটামিন খেলে অপকার হবার সম্ভাবনা।

ভিটামিনের মাহাত্ম্যের কথা সকলেই জানেন। কোন্ কোন্ ভিটামিনের অভাবে কি কি রোগ বা উপসর্গ দেখা দেয় তাও অনেকেই জানেন এবং এ বিষয়ে বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু বাড়তি ভিটামিন খেলে বাড়তি স্বাস্থ্যলাভ তো হবেই না বরঞ্চ সুস্বাস্থ্য ব্যাহত হয়, বর্তমানে সেই বিষয়েই আলোচনা করা হবে।

ভিটামিনের সংখ্যা অনেক। ইংরাজি বর্ণমালার নাম দিয়ে সেগুলির বেশীর ভাগকে সনাক্ত করা হয়।

ভি—এ অতি প্রয়োজনীয়। এটি বিশেষ করে শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি, ত্বকের উপরিভাগের কোষ, চক্ষু প্রভৃতির সুস্থতার পক্ষে অপরিহার্য। সুতরাং চক্ষুগোলকের শ্লৈষ্মিক ঝিল্লির ক্ষতি (xerophthalina) রাত্রিঅন্ধতা (nightblindness), ব্রণ প্রভৃতি রোগে 'এ' প্রচুর ব্যবহার করা হয়। এইরূপ চিকিৎসার সময় অসতর্কত বা অনবধানতা বশতঃ বহুদিন ধরে ভি-এ- ব্যবহার করা হয়েছে এই রকম ক্ষেত্রে রোগীর বেশ কয়েকটি উপসর্গ দেখা দেয় যথা—মস্তিস্কের আভ্যন্তরিক চাপ বৃদ্ধি হয়, ফলে মাথার যন্ত্রণা ও বমি হতে পারে। বিশুদ্ধ, কৃত্রিম 'এ' সেবনেই এ উপসর্গ হতে দেখা যায়। প্রাকৃতিক উৎস যেমন হ্যালিবাট লিভার অয়েল খেলে ঐ উপসর্গ হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে। কয়েকটি চর্ম রোগে কৃত্রিম ভি-এ কয়েক বছর পর্যন্ত ক্রমাগত ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেসব রোগীর দেখা গেছে মাথার যন্ত্রণা, দৃষ্টিক্ষীণতা দৃষ্ট বস্তু দ্বিত্ব দেখা (Double Vision) যকৃতের স্ফীতি ইত্যাদি দেখা যায়। অন্তঃসত্ত্বা মায়েরা 'এ' বেশী মাত্রায় খেলে সন্তানের স্নায়ুতন্ত্রের এবং অন্যান্য জন্মগত ত্রুটি দেখা দিতে পারে।

ভি-বি গোষ্ঠী। কয়েকটি সমগোত্রীয় ভিটামিন একসংগে ভি-বি গোষ্ঠী (Vitamin B Complex) বলা হয়। এই গোষ্টীর বিভিন্ন ভিটা-

মিনের বিভিন্ন নাম আছে। প্রত্যেকটিরই শরীরে আলাদা আলাদা উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা আছে। এদের অপকারিতা সম্বন্ধে আপাতত খুব বেশী তথ্য নাই। তবে রিবোফ্লেভিন সুপরারিনাল (Suprarinal) অন্তঃস্রবী গ্রন্থির (ductless gland) কিছু ক্ষতি করে বলে অনুমান হয়। এই গোষ্ঠীর আর একটি ভিটামিন–'ফোলিক এ্যাসিড'—যা রক্তাল্পতা দূর করতে বিশেষ করে অন্তঃসত্ত্বা নারীর, অত্যাবশ্যক। কিন্তু অত্যাধিক ফোলিক এ্যাসিড খেলে ক্যান্সার হবার সম্ভাবনা থাকে, বিশেষ করে বয়স্কদের, এরকম একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। সুতরাং সতর্ক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

ভি-সি—শরীরে ভি-সির অভাব হলে দাঁতের মাড়ির উপসর্গ দেখা দেয় এবং স্কার্ভি রোগের উৎপত্তি হয়। কিছুকাল পূর্বে একটি মত প্রচলিত হয়েছিল যে ভি-সি সেবন করলে সর্দির ও ইনফ্লুয়েঞ্জার মত রোগে বিশেষ উপকার হয় এবং এই ভিটামিন ঐ সব রোগের প্রতিষেধক হিসাবে ব্যবহার করা হত। খুব ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করে প্রমাণিত হয়েছে যে সর্দিজ্বরে ভিটা-সি-র উপকারিতা সন্দেহজনক। অথবা কিছু উপকার পেলেও তা ধর্তব্যের মধ্যে নয়। উপরিক্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে দৈনিক প্রয়োজনের ৫০ থেকে ১০০ গুণ বেশী সি খাওয়া শুরু হল। স্বভাবতই ধারণা এই ভিটামিন নিরাপদ এবং যত খাওয়া যায় ততই ভাল। এখন দেখা যাচ্ছে অত বেশী পরিমাণ সি-ভিটা খেলে প্রস্রাবে অকস্যালিক লবণের (oxalate) আধিক্য হয় ফলে মূত্রাশয়ে পাথর হবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়। এছাড়া অন্যান্য ধাতব লবণের বিপাক ক্রিয়াও ব্যাহত হয়। কারো মতে গর্ভপাতও হতে পারে। আবার অত্যধিক পরিমাণে ভিসি খেতে যদি হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে স্কার্ভির মতো উপসর্গ দেখা দেয়। পুনরায় ভি-সি খেলে অবশ্য ঐ উপসর্গের উপসম হয়। নোবেল পুরস্কারবিজয়ী বিজ্ঞানী লিনাস পলিংএর মতে ভি-সি মানুষের বুদ্ধিমত্তা

বাড়ায়। খুব উৎসাহজনক তথ্য নয় কি? তার পরেই তিনি বলেছেন ৫ থেকে ১০০ মিঃ গ্র,: পর্যন্ত খাওয়া যেতে পারে।

ভি—ডি : সুষম খাদ্য থেকে শরীরের প্রয়োজনে যথেষ্ট ভি—ডি পাওয়া যায়। এতাবৎ পর্যবেক্ষণে এর কোন অপকার ধরা পড়ে নাই। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে কৃত্রিম ডি বেশী পরিমাণে এবং দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে (রিকেট প্রভৃতি রোগে) রক্তবাহী নলে ক্যালসিয়ামের স্তর পড়তে থাকে এবং শরীরে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তার ফলে ক্যালসিয়ামের অভাবজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব হয়।

আজকাল আর একটি রীতির প্রচলন হয়েছে। শিশু জন্মাবার পর থেকেই তাকে ভিটামিন খাওয়ান শুরু হয়। ধারণা করা হয় শিশুকে ভিটামিন খাওয়ালে তার বাড়বাড়ন্ত হবে। কিন্তু শিশু বিশেষজ্ঞরা ধৈর্য সহকারে তথ্য সংগ্রহ করে দেখেছেন যে ভিটামিন খাওয়ান এবং না খাওয়ান শিশুদের মধ্যে পুষ্টির কোন তারতম্য দেখা যায় না। ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার পরিসংখ্যানে অল্প তফাৎ দেখা যায় এই মাত্র।

সুস্থ থাকতে হলে সুষম খাদ্যের প্রয়োজন। অতি উৎসাহে শরীরকে আরো সুস্থ করবার জন্য খাদ্যের উপাদানগুলি যদি অধিক মাত্রায় খাওয়া যায় তাহলে অবশ্যই বিপদ হবার সম্ভাবনা তা সে-যে উপাদানই হোক। শর্করা, স্নেহ, প্রোটিন প্রভৃতি উপাদানের অধিক হারে বিরূপ ফল প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভূত হয়। কিন্তু ভিটামিনের মত উপাদান যার প্রয়োজন এত কম মাত্রায় এবং যার স্থূল ভাবে কোন ক্রিয়া থাকে না সেক্ষেত্রে তার মাত্রাধিক্যের অপকার সহজে অনুভূত হয় না। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও অত্যধিক মাত্রা এবং দীর্ঘদিন যাবৎ ভিটামিন খেলে অপকার হতে পারে এটা বোঝা যাচ্ছে।

যতদিন যাচ্ছে ততই ভিটামিনের অপকারিতা সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। আমরা খাদ্য থেকে যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন সংগ্রহ করতে পারি। কিন্তু ভিটামিনের উপকারিতা ও গুণাগুণ শুনে অনেকেই ভিটামিন খাওয়ার জন্য প্রলুব্ধ হন। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে কিন্তু অযথা নয়। ওষুধ প্রস্তুতকারকরা ঐ মনস্তত্ত্বের সুযোগ নিয়ে অধিক পরিমানে ভিটামিনযুক্ত টেবলেট—ক্যাপসুল-সিরাপ ইত্যাদি বিক্রী করেন এবং আকর্ষক বিজ্ঞাপন দেন। এই সব অপকীর্তি রোধ করবার জন্য বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তথ্য সংগ্রহের পর ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত ভিটামিনগুলির ঊর্ধ্বসীমার পরিমাণ ধার্য করে দিয়েছেন এবং ঐ নির্দেশ অনুযায়ী ওষুধ তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন। ভারত সরকারও ঐ নির্দেশ মানতে বলেছেন।

ভিটামিন ও লবণের উৎস

ভিটামিন ও লবণের প্রায় সব খাদ্যেই অল্পবিস্তর অস্তিত্ব থাকে। ফল ও শাকসব্জীতেই ভিটামিন-লবণের ভাগ বেশী। যাঁরা ফল খেতে পারেন তাঁদের পক্ষে চিন্তার কারণ নেই। কিন্তু শাকশব্জীতেও যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন লবণ পাওয়া যায়। সে বিষয়ে কিছু বলা হবে।

বিবেচনা করে সুষম খাদ্য খেলে ভিটামিন এবং অত্যাবশ্যক ধাতব লবণ সংগ্রহের অভাব হয় না। খাওয়ার সময় ভাত ডালের পরই আমরা আমিষ খাদ্যের দিকে ঝুঁকি। সব্জির পদগুলো যেমন শুক্তো, চচ্চড়ি, ঘন্ট, প্রভৃতিকে কোন মূল্য দিই না। শাকের কথা নাই বা তুললাম। শুক্তো, চচ্চড়ি, ঘন্ট প্রভৃতির উপাদান প্রায় একই রকম। ফোড়ন এবং রান্নার তারতম্যে এদের বিভিন্নতা। পাকা রাধুনির হাতের শুক্তো, ঘন্ট, চচ্চড়ি একবার খেলে আর ভোলবার নয়। শুক্তোর উপাদান হল--

উচ্ছে, করলা, কাঁচকলা, রাঙ্গাআলু, মূলো, বেগুন। চচ্চড়িতে থাকে কুমড়ো, ঢেঁড়স, পুঁইশাক ইত্যাদি।

এবার এগুলির উপকারিতা সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা যাক প্রথমে ভিটামিনের কথা বলি। ভিটামিন 'এ' পাই—কাঁচকলা, রাঙ্গাআলু উচ্ছে, করলা, মূলো, কুমড়ো, গাজোর। বেশী আছে উচ্ছে করলাতে ভিটামিন বি গোষ্ঠী (ক) বি-১ পাই—করলা, লালমূলো শাকসব্জীতে (খ) নিয়াসিন (Niacin)—রাঙ্গাআলু, করলা, উচ্ছে, লালমূলো, বেগুন কুমড়ো, কলাতে বেশী আছে। (গ) রিবোফ্লোভিন (Ribaflavine) কাঁচকলা, রাঙ্গাআলু, লাল মূলো, বেগুন কুমড়োয়। কাঁচকলা রাঙ্গা আলুতে খুবই বেশী আছে।

ভিটামিন সি পাই—উচ্ছে, করলা, লাল মূলো, উচ্ছে ও করলাতে খুব বেশী।

ধাতব লবণও শরীরে থাকা প্রয়োজন যা টনিকের মধ্যেও থাকে সব্জীতে কীরকম লবণ পাওয়া যায় দেখা যাক। (ক) ক্যালসিয়াম পাই—মূলো, বেগুন, কুমড়ো ঢেঁড়স ইত্যাদিতে। ফসফরাস পাই—রাঙ্গাআলু উচ্ছে, করলা, মূলো, বেগুন, ঢেঁড়সে। লোহা পাই—রাঙ্গাআলু, উচ্ছে করলা, মূলো, বেগুন, ঢেঁড়স থেকে। করলাতে বেশী।

তাহলে দেখা যাচ্ছে চচ্চড়িকে ভিটামিন ও ধাতব লবণের মিক্সচার বললে অত্যুক্তি হবে না। উপরন্ত এগুলি খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য হবার সম্ভাবনাও কম থাকে—বিশেষ করে বয়স্কদের পক্ষে। কাজেই শাক চচ্চড়িকে হেয় করবেন না, আদর করে পাতে তুলে নিন্। তবে যাঁরা পাকস্থলী বা অন্ত্রে প্রদাহজনিত অসুখে গ্যাসটাইট্রিস, পেপটিক আলসার বা কোলাইটিসে ভুগছেন তাঁদের পক্ষে শাক বা ছিবড়ে জাতীয় সব্জী একটু ভেবে চিন্তে খেতে হবে—এক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মতে চললে ভাল হয়।

মশলার গুণাগুণ

আমিষ হোক আর নিরামিষ হোক মানব সভ্যতায় কাঁচা খাওয়ার রেওয়াজ বহুদিন লুপ্ত হয়ে গেছে। কাঁচা খাওয়ার পর এসেছিল পুড়িয়ে খাওয়া, তারপর সেদ্ধ। ক্রমশ খাদ্যবস্তুগুলিকে বিভিন্ন স্বাদ ও সুগন্ধিযুক্ত দ্রব্য অর্থাৎ মশলা মিশ্রিত করে তৈরি হল ব্যঞ্জন তথা রন্ধন শিল্প। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় আজ খাদ্যের পদ অসংখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। রন্ধনের অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে মশলাও এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ সবেরই উদ্দেশ্য খাদ্যকে রুচিকর এবং উপাদেয় করে তোলা। যে দ্রব্যগুলি মশলা হিসাবে ব্যবহার করা হয় সেগুলি সবই উদ্ভিদজাতীয়। ফল, মূল, ফুল, কাণ্ড, কন্দ, পাতা প্রভৃতি উদ্ভিদের প্রায় সকল অংশই মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মশলার স্বাদ, সুবাস নির্ভর করে তার মধ্যে অবস্থিত উদ্বায়ী তেলের (volatile oil) উপর। বিভিন্ন মশলা ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিশিয়ে ব্যঞ্জনগুলিকে বিভিন্নভাবে মুখ-রোচক করা হয়।

যদিও মশলাকে খাদ্যের উপাদান হিসাবে গণ্য করা হয় না তবুও খাদ্যের মধ্যে তার একটি বিশেষ ভূমিকা ও উপযোগিতা আছে। পুষ্টি-বিশারদরা একবাক্যে বলেন যে খাদ্য শুধু উপাদানে সুষম হলে চলবে না, খাদ্যকে ভোক্তার কাছে রুচিকর ও আকর্ষক করারও প্রয়োজন আছে। আগেই বলা হয়েছে ভোজনে একটা অর্থ আনন্দ। এখন দেখা যাক ব্যঞ্জনকে সুস্বাদু করে তোলা ছাড়া মশলার আর কোন গুণ আছে কিনা। আয়ুর্বেদে প্রায় সব মশলাই ঔষধ বা ঔষধের অনুপান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আধুনিককালে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে মশলাগুলির নানারকম উপকারিতা প্রমাণিত হয়েছে। বর্তমানে নূতন নূতন অধিক ফলদায়ক ঔষুধ আবিষ্কার হবার ফলে এদের ব্যবহার সীমিত অথবা লুপ্ত হয়ে গেছে। কবিরাজরা অবশ্য এখনো এগুলির প্রচলন রেখেছেন।

বিভিন্ন মশলার গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য

প্রাচীন অভিজ্ঞতা এবং আধুনিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন মশলার স্বকীয় গুণাগুণ সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক--

(১) হলুদ—শোষ ও ন্যাবায় ব্যবহৃত হয়। এতে ক্যালসিয়াম, ফসফর লৌহ প্রভৃতি ধাতব পদার্থ আছে।

(২) জিরা—তিন রকম, সাদা কালো ও শা জিরা, সবই ধন্যক গোত্রে উপকার একই রকম। ক্ষুধা ও স্মরণশক্তি বাড়ায়। ক্যালসিয়া ফসফরাস, ভিটামিন-এ ও বি আছে।

(৩) ধনে—লঘু, ক্ষুধাবর্ধক ও রুচিকারক। ক্যালসিয়াম ফসফরা ক্যারোটিন আছে।

(৪) লঙ্কা--ক্ষুধাবর্ধক ও কফনাশক। এর সংযত ব্যবহার উচিত কাঁচা লঙ্কায় অল্প পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, লৌহ ক্যারোটিন আছে। এছাড়া ভিটামিন বি ও সি আছে। লঙ্কা ঝাঁঝের কারণ ক্যাপসিয়াসিন নামক উপাদান। পূর্বে অ্যালোপাথি ঔষধে টিংচার ক্যাপসিকাম ব্যবহৃত হত।

(৫) গোল মরিচ--বায়ুনাশক ও ক্ষুধা উদ্রেককারী। মরিচে অপেক্ষাকৃ বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ আছে। অল্প পরিমাণে বি ও সি ভিটামিন আছে।

(৬) হিং-ক্যালসিয়াম ফসফরাস্ ও লৌহ আছে।

(৭) মেথি - বায়ু ও শ্লেষ্মানাশক। বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়া ফসফরাস ও লৌহ আছে

(৮) রাধুনি - বায়ু ও কফনাশক।

(৯) তেজপাতা - বায়ু ও কফনাশক। অরুচি ও বমিভাব দুর করে।

(১০) লবঙ্গ – জাম গোত্র গাছের অপ্রস্ফুটিত পুষ্পমুলই লবঙ্গ। বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম অল্প ফসফরাস ও লৌহ বর্তমান।

(১১) রসুন – গাছের কন্দ। কিছু ফসফরাস ও ভিটামিন আছে। পূর্বে বায়ুনাশক হিসাবে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে রক্তের কোলেস্টেরল সীমিত করার গুণ তথা হৃদরোগ প্রতিষেধক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

(১২) আদা – সামান্য ক্যালসিয়াম ফসফরাস ও লৌহ আছে। কিছু ভিটামিন এ, বি, গোষ্ঠী ও সি আছে।

(১৩) আমাদা – স্কন্দ জাতীয় দ্বিবর্ষজীবী গাছ। কন্দমূলে কাঁচা আমের গন্ধ বেরোয় বলে একে আমাদা বলা হয়। চাটনীতে ব্যবহৃত হয়। অরুচি, ঝিনঝিনে বাত ইত্যাদিতে উপকার পাওয়া যায় হয়।

(১৪) কালো ও সাদা রাইসরিষা – বেশি পরিমাণে ক্যালসিয়াম ফসফরাস, লৌহ ও ক্যারোটিন আছে।

(১৫) জয়িত্রী – (বিরুট বৃক্ষ) – ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ আছে।

(১৬) মৌরী – বায়ু ও কফনাশক। বমন ও কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করে।

(১৭) এলাচ – বড় ও ছোট – শীতল, লঘু ও বায়ুনাশক। বড় এলাচ অগ্নি বর্ধক।

(১৮) দারুচিনি – গাছের ছাল। বায়ু ও পিত্তনাশক।

(১৯) তেঁতুল শাস – আমাদের দেশে অনেক ব্যঞ্জনেই টক অর্থাৎ তেঁতুল শাঁস দিয়ে রান্নার রেওয়াজ আছে। এই টক দিয়ে রান্নার দরুন স্বাদ যেমন বাড়ে তেমনি রান্নার সময় ভিটামিন 'সি' নষ্ট হতে দেয় না। এতে ক্যালসিয়াম, ফসফরাস ও লৌহ পাওয়া যায়।

(২০) লবণ – লবণকেও মশলার পর্যায়েই রাখতে হয়। দৈনিক যে লবণ খাই তা কয়েকটি ধাতব লবণের মিশ্রণ কিন্তু তার মধ্যে ৯৯ শতাংশ হল সোডিয়াম ক্লোরাইড। সোডিয়াম ধাতু শরীরের বিপাক ক্রিয়ার জন্য দরকার। সারাদিনে ২ গ্রাম লবণ খাওয়ার প্রয়োজন। কিন্তু বেশি পরিমাণে খেলে ক্ষতিকর। আজকাল আমাদের দেশে চীনা খাবারের খুব প্রচলন হয়েছে। শুধু হোটেলে নয় অনেক বাড়ীতেও চীনা খাবার রান্না করা হয়। চীনা রান্নায় একরকম লবণ ব্যবহার হয় যার নাম সোডিয়াম – গ্লুটামেট। এর প্রয়োগে ব্যঞ্জনের একটি বিশেষ ধরনের স্বাদ হয়, কতকটা মাংসের মত। সোডিয়াম গ্লুটামেট খুব কম পরিমাণে ব্যবহার করা উচিত না হলে একটু শারীরিক অস্বস্তি (মাথা ধরা) দেখা দিতে পারে।

উপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে মশলায় রুচিকারিতা ছাড়া অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদানও আছে। প্রায় সব মশলাতেই শরীরের পক্ষে অত্যাবশ্যক ধাতব লবণ যথা – ক্যালসিয়াম, ফস-ফরাস ও লৌহ আছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু ভিটামিন আছে। মশলা যেহেতু অল্প পরিমাণে খাওয়া হয় সেই হেতু এবং খাদ্যগুণ থাকলেও খুব সীমিতভাবে থাকে। সুতরাং উপাদানগুলি পাওয়া যায় অল্প পরিমাণে।

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে ভারতীয়রা দৈনিক মাত্র ৭ থেকে ১০ গ্রাম মশলা খেয়ে থাকে। কিন্তু খুব গরীব ঘরেও কিছু না কিছু মশলা খাওয়া হয়, সে ক্ষেত্রে হয়ত কিছু পরিমাণে খাদ্যপ্রাণ সংগৃহীত হয়। মশলার ব্যবহার সম্বন্ধে নানারকম মত

শোনা যায়। মশলা দেওয়া খাবারই যাবতীয় পেটের গোলমালের কারণ এবং ইউরোপীয় ধরনের মশলা ছাড়া সেদ্ধ খাদ্য খাওয়াই ভাল এরকম পরামর্শ আগে দেওয়া হত, এখনও দেওয়া হয়। এধারণা কিন্তু সর্বাংশে ঠিক নয়। এটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে খাদ্যে যতই মূল্যবান উপাদান থাকুক না কেন তা রুচিকর না হলে হজম ও বিপাকক্রিয়া ঠিকমত হয় না। অবশ্য সব-কিছুরই একটা মাত্রা আছে, সেটা মশলার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

রুচি—রন্ধন—পুষ্টি

যে কোন খাদ্যই হোক যদি রুচিকর এবং সুস্বাদু না হয় তাহলে আহারে উৎসাহ থাকে না। সুতরাং কাঁচা খাওয়ার খাদ্য ছাড়া (ফল প্রভৃতি) আর সবই খাদ্য কোন না কোন প্রকারে রন্ধন করে খেতে হয়। ব্যঞ্জন যেমন রুচিকর করার প্রয়োজন আছে তেমনি লক্ষ রাখতে হবে রন্ধন প্রণালীর দোষে খাদ্যের গুণগত ক্ষয়ক্ষতি না হয়। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন উপায় রন্ধন প্রণালী ও তার দোষগুণের আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাচীন কবি কালিদাস বলেছেন "আশ্বাসঃ পিশাচো হপি ভোজনেন"। অর্থাৎ পিশাচকেও ভোজন দ্বারা বাগে আনা যায়। কথাটা হাস্যরসাত্মক হলেও বাস্তব সত্যের খুব কাছাকাছি। পরবর্তী কালেও বহু কবি এবং লেখক সুযোগ পেলেই সুখাদ্যের ব্যাখ্যায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠেছেন। একজন কবিতায় বলে বসলেন "—সাত পাত ভাত ওঠে ভ্যাভ্যা রব শুনে"। গৃহিণী যদি সু-রাঁধুনী হন তাহলে কর্তার মান ভাঙ্গাতে বেশি অনুনয় করতে হবে না। প্রাচীন কালে রন্ধন শৈলীকে চৌষট্টি কলার অন্যতম কলা বলে গণ্য করা হত। বস্তুত রন্ধন শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ সুকুমার কলা বলে গণ্য করা হত। আদিম মানুষত সব খাদ্য কাঁচা খেতে অভ্যস্ত ছিল। আমিষ নিরামিষ সবই কাঁচা খেত। যেই আগুন আবিষ্কৃত হল অমনি কাঁচা ছেড়ে ঝলসে খেতে শুরু করল। ক্রমশ মানুষের রুচি বদলাতে লাগল। কাঁচা খাওয়ার বদলে রেঁধে খাওয়ার ফ্যাসন ধরল এবং সেদিন থেকে রান্নার প্রক্রিয়া নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল এবং সকল ফ্যাসনের মত রান্নার ফ্যাসনও হুহু করে বাড়তে ও বদলাতে লাগল। রন্ধনশিল্পীরা ক্রমশ খাদ্যের নানা রকম পদ সৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু শাকসব্জী এবং ফল কাঁচা খাওয়া যায়, কিন্তু বাকী সব্জী এবং মাছ মাংস রেঁধে খাওয়া ছাড়া হজম করা যায় না। তাই এগুলি রেঁধে

খেতে হয়। রেঁধে খাওয়ার খাদ্যগুলিতে সিদ্ধকরা ছাড়া রুচিকর করবার জন্য নানান মশলা, তেল, ঘি, টক, মিষ্টি দ্রব্যের সহযোগে রান্না করা হয়ে থাকে। শেষ অবধি দেখা গেল খাদ্যের মূল উপাদানের চেয়ে আনুষঙ্গিক বস্তুগুলির উপর বেশি জোর দেওয়া হতে লাগল। কিন্তু খাওয়া ত শুধু জিভের তৃপ্তির জন্য নয় তার সংগে শরীরের পুষ্টি ও স্বাস্থ্যের সম্বন্ধ রয়েছে। আমরা গতানুগতিক ঐতিহ্য পরম্পরায় অথবা গুণাগুণ অনুযায়ী খাদ্য নির্বাচন করেও থাকি। প্রশ্ন হল, যে খাদ্যগুলি আমরা রান্না করে খাই রান্নার পর সেগুলির আকাংক্ষিত গুণাগুণ বজায় থাকে ত ?

রন্ধন করা খাদ্যে পুষ্টিকর অংশ যথাযথ বজায় থাকে কিনা, যদি না থাকে ত পুষ্টির বিনাশ কিভাবে রোধ করা যায়। এবিষয়ে আপাতত যা তথ্য পাওয়া গেছে তা নিয়ে রান্নার পদ্ধতির দরুণ ক্ষয়ক্ষতির আলোচনা করা হবে। প্রথমেই বলে রাখি রান্না করার প্রাথমিক উপকারিতা হল খাদ্যকে সুস্বাদু এবং সুপাচ্য করা। রান্নায় তাপের উপকারিতা হল — (১) আমিষ খাদ্য রান্না করলে চিবোবার সুবিধা হয় এবং চর্বিত মণ্ড পাকস্থলীর পাচক রসে সহজে জারিত করে প্রোটিন সংশ্লেষের সুবিধা হয়। (২) দানা শস্য, ডাল এবং সব্জীর কঠিন সেলুলোজ আবরণও নমনীয় হয়ে পাচনের সুবিধা হয়। (৩) পরিশেষে তপ্ত করার দরুন খাদ্যগুলি জীবাণুমুক্ত হয়।

প্রথমে তণ্ডুল জাতীয় খাদ্যের কথা ধরা যাক। চাল শর্করা জাতীয় খাদ্য হলেও এতে ভিটামিন-বি-জোট এবং ধাতব লবণ থাকে। চালের উপরিস্তরেই (পেরিকার্প) ঐগুলি থাকে। ভাত রান্নার আগে চাল ধুয়ে নেবার রীতি আছে। চাল ধুয়ে ভিটামিন বি-জোটের দুটি অংশ থিয়ামিন ও নিকোটিনিক এ্যাসিড এবং ফসফরাস প্রভৃতি ধাতব পদার্থও ধুয়ে বেরিয়ে যায়। আতপ চালের চেয়ে সিদ্ধ চাল ধোয়া হলেও ক্ষতির

পরিমাণ কম। ধোয়ার জন্য যে ক্ষতি হয় সেটা প্রথম ধোয়াতেই হয় অর্থাৎ একবার এবং বার বার ধোয়ার কুফল প্রায় একই। এরপর ভাত রান্নার সময় যদি জল বেশি পরিমাণে দেওয়া হয় এবং পরে ফ্যান ফেলে দেওয়া হয় তাহলে বাকি ভিটামিনটুকুও থাকে কিনা সন্দেহ। রান্নার সময় এমন পরিমাণে জল দেওয়া উচিত যাতে বেশি ফ্যান না হয়। একটি কথার উল্লেখ করতে পারা যায়, অনেকের ধারণা ফ্যান খুব উপকারী। কিন্তু ঐ ভিটামিন অংশটুকু ছাড়া ফ্যানের আর কিছু পুষ্টিক্ষমতা নেই।

রন্ধনের নানা পদ্ধতি, তাও আবার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রকার। সাধারণত তিন প্রকার উপায়ে রান্না করা হয়। ভাপে সিদ্ধ করা, জলে সিদ্ধ করা এবং স্নেহপদার্থের সাহায্যে ভাজা। যে ভাবেই রান্না করা হোক কিছু পুষ্টিকর অংশ নষ্ট হবেই। মূল উপাদান যেমন শর্করা, প্রোটিন ও চর্বির ক্ষতি সামান্য, ভিটামিন, ধাতব লবণ প্রভৃতির ক্ষতি বেশি। এই ক্ষতি দুভাবে হতে পারে। একটি হল সিদ্ধ করার সময় খাদ্যবস্তু থেকে জলে দ্রব ভিটামিন এবং ধাতব লবণগুলি চুঁইয়ে বেরিয়ে যায়। দ্বিতীয় হল, অধিক তাপের জন্য কিছু ভিটামিন নষ্ট হয়ে যায়। চর্বিতে দ্রব-ভিটামিন ফুটন্ত তাপেও ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। ভাজা রান্নাতেও সাধারণত ঐসব ভিটামিন নষ্ট হয় না। কিন্তু অগভীর পাত্রে (চাটু, প্যান) ভাজা করলে বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসার ফলে ভিটামিন-এ সম্পূর্ণ-ভাবে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বি জোটের ভিটামিন বড্ড তাপকাতর, প্রায় ত্রিশ শতাংশই নষ্ট হয়ে যায়। ভিটামিন সি বায়ুসংস্পর্শে রান্না করলে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা সমধিক। এই জন্য পাত্রের উপর ঢাকা বা চাপা দিয়ে রান্নার পদ্ধতিটি ভাল। এছাড়া সব্জী ভাজবার সময় গরম (বেশী পরিমাণে) অর্থাৎ ছাঁকা ঘি বা তেলে ভাজলে ভি সি কম নষ্ট হয়। চাটু বা সসপ্যানে অল্প ঘি তেল দিয়ে ধীরে ধীরে তাপ বাড়িয়ে ভাজলে 'সি' নষ্ট হয়ে যায়। প্রেসার কুকার যদিও তাপমাত্রা ফুটন্ত জলের চেয়ে অনেক বেশী হয় কিন্তু রান্নাটা তাড়াতাড়ি সারা হয়ে যায় বলে ভি সি

নষ্ট হবার সুযোগ থাকে না। প্রেসার কুকারে আলু রাঁধলে প্রায় ৮০% সি বজায় থাকে। রান্না করা খাদ্য বার বার গরম করলে উত্তরোত্তর ভিটামিন ক্ষয় হয়।

ভাত, ডাল, মাংস যে ভাবে সাধারণত রাঁধা হয় তাতে স্নেহ বা শর্করার বিশেষ ক্ষয় হয় না। কিন্তু প্রোটিনের লাইসিন ও সালফার ঘটিত এ্যামাইনো এ্যাসিডের কিছু ক্ষতি হয়, এগুলি শরীরের প্রয়োজনীয় উপাদান। সব্জী যদি সিদ্ধ করে রাঁধা হয় তাহলেও প্রোটিনের অল্প ক্ষতি হয়। বিশেষ করে যদি লবণ ও বেশী মিষ্টি দিয়ে রান্না করা হয় এবং জল ফেলে দেওয়া হয়। সিদ্ধ করা রান্নায় ধাতব লবণ বেরিয়ে ঝোলের সংগে মিশে যায়—প্রধানত সোডিয়াম পটাসিয়াম এর ফ্লোরাইড। রান্নার সময় প্রয়েজনাতিরিক্ত জল দেওয়া উচিত এবং ঝোল বা সুরুয়ার সদ্ব্যবহার করা উচিত। মাটির তলায় যে সব সব্জী হয় সেগুলির পুষ্টিকর অংশ সিদ্ধ বা ভাজায় বিশেষ তারতম্য হয় না। মূল জাতীয় সব্জী গাত্রস্তর ভেদ করে কতক লবণ মিশ্রিত হতে পারে না, সেই জন্য ঐগুলিকে খোসাশুদ্ধ সিদ্ধ করলে পুষ্টিকর অংশ বজায় থাকে। সব্জী আমরা কেটে টুকরা করে রান্না করি। সব্জী যখন কাটা হয় তখন তার কোষগুলি উত্তেজিত হবার দরুণ একপ্রকার উৎসেচক নির্গত হয় যেটি ভিটামিন সি-র ক্ষতি-কারক। ঐ উৎসেচক ৬০° সেঃ তাপে অকেজো হয়ে যায়। সুতরাং সব্জী-খন্ডগুলি যদি যথাসম্ভব শীঘ্র ফুটন্ত জলে ছাড়া যায় তাহলে ভিটাঃ সি কিছুটা বাঁচে। সব্জীখণ্ডগুলো ঠাণ্ডা জলে ছেড়ে আস্তে আস্তে ফোটানো যায় তাহলে ভিটাঃ সি নষ্ট হয়ে যায়। রান্না যত তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা যায় ভিটাঃ এর ক্ষতি কম হয়। সব্জী রান্না করার আগে কোন কোন সব্জীর খোসা ছাড়িয়ে নেওয়া রীতি আছে। সিদ্ধ করার সময় খোসা ছাড়ানো থাকলে ধাতব লবণ বেরিয়ে যাবার সুযোগ থাকে এবং যত ছোট খণ্ড করা হবে ততই লবণগুলি বেরিয়ে যাবার সুযোগ পাবে।

সব সময়েই ঝোলটা খাওয়া হলে কিছুটা অবশ্য ফিরে পাওয়া যায়। জলে সিদ্ধ না করে ভাপে সিদ্ধ করলে পুষ্টিক্ষয় কম হয়।

যেসব ভিটামিন জলে দ্রাব্য (ভিটাঃ বি, সি) সেগুলি যদিও রান্নার সময় নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকে তবুও সাধারণ পদ্ধতিতে রান্নায় ভিটামিন এ ও বি বেশী নষ্ট হয় না। কখনও কখনও ব্যঞ্জনে সোডা মেশানো হয়, সোডা মেশালে ভিটাঃ-এর সমূহ ক্ষতি হয়। অপর পক্ষে যদি টক মেশানো হয় তাহলে ভিটামিন নাশ হয় না। ব্যঞ্জন রাঁধবার সময় অনেকেই তেঁতুল বা দৈ মিশিয়ে রান্না করেন। তাতে স্বাদ যেমন বাড়ে তেমনি ভিটামিনের সাশ্রয় হয়। রান্নাতে এ ও বি অপেক্ষা সি ভিটামিন কম নষ্ট হয়। এখানে আর একটি প্রসঙ্গ মনে রাখতে হবে—রান্নার পর খেতে যত দেরী হবে ভিটামিন সি ক্ষয় হবার সম্ভাবনা তত বেশী অর্থাৎ সি যুক্ত খাদ্য খেলেও পাকস্থলী আশানুরূপ সি পাবে না। ভাজার জন্য খাদ্যের পুষ্টিকর উপাদান তেমন নষ্ট হয় না। ভাজার সময় ঘিয়ের ভিটাঃ এ কিছুটা অবশ্য নষ্ট হয়ে যায়। মাখন থেকে যেভাবে ঘি তৈরী করা হয় তাতে শতকরা ২৫ ভাগ ভিটামিন এ বিনষ্ট হয় অর্থাৎ মাখন অপেক্ষা ঘিয়ে ভিটামিন এ কম থাকে।

দুধ বেশী ফোটালে বেশীর ভাগ ভিটামিন সি এবং কিছুটা এ নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু ক্যারোটিন এবং ভিটামিন বি জোটের বিশেষ ক্ষতি হয় না। ডিম রান্না করলে ভিটামিনের বিশেষ ক্ষতি হয় না।

আমাদের দেশে লোহার পাত্রে রান্না করার রেওয়াজ আছে। লোহার কড়ায় রান্না করলে তরকারীতে ধাতব লৌহ আশ্রিত হয় (লোহিত রক্ত কণিকার একটি বিশেষ উপাদান হল লৌহ)। পাত্র নূতন হলে লোহার অংশ বেশী পাওয়া যায় পুরানো হলে লোহার অংশ শতকরা চার-পাঁচ ভাগ কম পাওয়া যায়। লোহার পাত্রে রান্না করলে শরীরের লৌহের চাহিদা

কিছুটা মেটানো সম্ভব। কিন্তু সে ক্ষেত্রে রক্তাল্পতা রোগ (এ্যানিমিয়া) হয়েছে সেখানে কিন্তু এই ভাবে লোহার চাহিদা মেটানো আশা করা উচিত নয়।

উপসংহার

এতাবৎ যা আলোচনা করা হল তা থেকে খাদ্যের উপাদান, উপাদান-গুলির সহজলভ্য উৎস, উপকারিতা, তাদের বিজ্ঞানসম্মত রন্ধন প্রণালী এবং আত্তীকরণের বিষয় আলোকপাত করা হয়েছে। স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য চাই সুষম বা আদর্শ খাদ্য অর্থাৎ প্রতিটি উপাদান প্রয়োজন অনুযায়ী নিত্য আহার করা। আর এক প্রকার আহারেও স্বাস্থ্যরক্ষা সম্ভব যাতে পুরাপুরি উপাদান অনুযায়ী না হলেও 'পর্যাপ্ত আহার' বলা যেতে পারে, অর্থাৎ পেট ভরে যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যদ্রব্য আহার করা। পর্যাপ্ত আহারেও শরীরের পুষ্টি বজায় থাকবে এবং শক্তিও (এনার্জি) পাওয়া যাবে কিন্তু রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা পাওয়া যাবে না, যেটি সুষম খাদ্য খেলে সম্ভব হয়। গুণগতভাবে যদি না পাওয়া যায় বা সামর্থ্য না কুলায় তাহলে পরিমাণের দিকে নজর দিতে হবে। অর্থাৎ শর্করা এবং ডাল সব্জী জাতীয় খাদ্যের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে। এছাড়া দুধ, ঘি, ডিম, মাছ, মাংস ইত্যাদি সপ্তাহে ২।৩ দিন খেলেও উপকার পাওয়া যাবে। এপ্রকার আহারকে সুষম না বললেও উৎকৃষ্ট আহার বলা যেতে পারে।

একটি মজার ব্যাপার হল খাদ্যে উপাদানগুলি শরীরের মধ্যে নিজে নিজেই আদানপ্রদানের দ্বারা কোন বিশেষ উপাদানের ঘাট্‌তি কিছুটা পূরন করে নিতে পারে।

মোট কথা মাছ, মাংস বিভিন্ন প্রকার সব্জী ঋতু অনুযায়ী যে কোন ফল খাদ্য ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খাওয়া যায় তাহলে পুষ্টি এবং শক্তি অর্জনের বিষয় নিশ্চিত থাকা যায়।

পরিশিষ্ট

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য একটি সুষম খাদ্যের নমুনা তালিকা দেওয়া হল। প্রতিদিনের সম্ভাব্য পরিমাণ :

তন্ডুল শস্য	৩৫০ গ্রাঃ
ডাল	৭০ ,,
সব্জী (শাক জাতীয়)	২৪০ ,,
সব্জী (কন্দ জাতীয়)	১৮০ ,,
সব্জী (অন্যান্য)	১৮০ ,,
ফল	১৮০ ,,
দুধ	১/৩ লিঃ
চিনি অথবা গুড়	৬০ গ্রাম
ভোজ্য তেল	৬০ ,,
মাছ বা মাংস	১৭০ ,,
ডিম	১ টি

আর একটি নমুনা—কি কি খাদ্য, কখন কিভাবে খাওয়া যেতে পারে।

প্রাতরাশ :-

(১) কল বারকরা ছোলা	--	--	৫৬ গ্রাঃ
বা কাঁচা মুগের ডাল	--	--	১৪০ গ্রাঃ
(২) গুড়	--	--	১৪ গ্রাঃ
(৩) নারিকেল	--	--	১/৪ মালা

মধ্যাহ্নভোজন :-

(১) চাল	--	--	--	১১২ গ্রাঃ + ১১২
(২) চাপাটি	--	--	--	১১২ ,, + ৬০
(৩) শাকসব্জী	--	--	--	৫৬ ,,
(৪) অন্যান্য সব্জী	--	--	--	৫৬ ,,
(৫) ডাল	--	--	--	৫৬ ,,
(৬) মাছ বা মাংস	--	--	--	১৭০ ,,

রাত্রে :-

(১) চাপাটি	--	--	--	২২৪ গ্রাঃ + ২২৪ গ্রাঃ
(২) ডাল	--	--	--	৫৬ গ্রাঃ + ৫৬ ,,
(৩) সব্জী	--	--	--	২২৫ গ্রাঃ
(৪) দুধ	--	--	--	২২৫ গ্রাঃ

যোগচিহ্ন দিয়ে যে পরিমাণগুলি লেখা আছে সেগুলি যাঁরা বেশি কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁদের বাড়তি খেতে হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে অনেকেই পর্যাপ্ত আহার করেন, বেছে বেছে পুষ্টিকর খাদ্যও খান কিন্তু সুষম আহার হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে খেয়ালও করেন না এবং ওয়াকিবহালও নন।

বঙ্গীয়
বিজ্ঞান
পরিষদ